বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৯/৪০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৮/১৪২৯

দুর্যোগ মোকাবেলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া*

১। ভূমিকা

দারিদ্র্যের ব্যাপ্তির সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূসংস্থানের জন্য ঐতিহাসিকভাবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি উর্বর ক্ষেত্র (Karim & Noy, 2020)। সাইক্লোনের ফলে বিশ্বে এ পর্যন্ত যত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, তার ৫০ শতাংশই ঘটেছে বাংলাদেশে। যদিও বিশ্বব্যাপী সংঘটিত সাইক্লোনের মাত্র ১ শতাংশ বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে (Amadore et al., 1996)। এই মৃত্যুহার বেশি হওয়ার একটি কারণ হলো ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত দুটো ভয়াবহ সাইক্লোন, যেখানে প্রচুর লোক মারা যায়। একটিতে প্রায় ৫ লাখ ও অন্যটিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে (Haque et al., 2012)। এ মৃত্যুর আরেকটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশের কয়েক কোটি মানুষ নিম্নাঞ্চলে (দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে) বাস করে, যেখানে ২০০৯ সালে আইলা নামক একই ধরনের বড় সাইক্লোন আঘাত হানে। এতে প্রায় ৩.৯ মিলিয়ন লোক আক্রান্ত হয়েছিল (IRIN, 2009)। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এলাকায় বসবাসকারী মানুষ সাধারণত জীবন জীবিকার জন্য সুন্দরবন ছাড়াও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষক ও দরিদ্রপীড়িত জনগোষ্ঠী ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডর ও ২০০৯ সালে সাইক্লোন আইলায় আক্রান্ত হয়েছিল। বর্তমান গবেষণাটি সাইক্লোন আইলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার কৃষকদের নিয়ে।

২। গবেষণা প্রবন্ধ (literature) পর্যালোচনা ও গবেষণা প্রশ্ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত গবেষণা প্রবন্ধে রেজিলিয়েন্স বলতে দুটো প্রত্যয়কে বোঝানো হয়। একটি হলো মোকাবেলা বা খাপ খাওয়ানো (coping), আর অন্যটি হলো অভিযোজন (Adaptation) (Manyena, 2006)। কৃষি ও কৃষক বিষয়ক গবেষণাগুলোতে রেজিলিয়েন্স বলতে একটি দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানোকে বোঝায় (Adger, 2000)। ২০০৫ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত World Conference on Disaster Reduction (WCDR), এ রেজিলিয়েন্স বলতে একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ দুর্যোগ থেকে সম্পদ ও জীবনকে রক্ষা করতে পারে (UNISDR, 2004)। এক্ষেত্রে একদল তাত্ত্বিক খাপ খাওয়ানোর ওপর বা দুর্যোগের পর পরেই মোকাবেলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। আরেকদল তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কাজে

*রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজনের উপর জোর দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে রেজিলিয়েন্স বোঝাতে দুটো ধারণাই ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা আমরা ফলাফল বিশ্লেষণের সময় বুঝতে পারব। সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকরা কিভাবে সাইক্লোন আইলার ক্ষয়ক্ষতি পোষাতে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেটাই তাদের খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি নির্দেশ করবে। আরেকদলের মতে, কৃষক পরিবার এ ধরনের দুর্যোগ থেকে স্থায়ীভাবে বাঁচার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে, সেগুলোকে তাদের অভিযোজন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

উন্নয়ন গবেষণায় 'রেজিলিয়েন্স বলতে একটি ব্যবস্থা বা সম্প্রদায়ের যে কোনো প্রকার দুর্যোগে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনযাপনকে সক্রিয় রাখার জন্য মোকাবেলা, খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনের সক্ষমতা বোঝায়।... এমনকি তারা যখন দীর্ঘমেয়াদে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তখন সেটার সাথে অভিযোজিত হয়ে নিজেদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের কষাঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করাকেই রেজিলিয়েন্স বলে' (Pasteur, 2011)। Matriot প্রমুখ (2019) রেজিলিয়েন্স বলতে বুঝিয়েছেন 'আর্থসামাজিক নিরাপত্তাকে, যা বহুমাত্রিক ক্ষতি, দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সক্ষম।' এ দুটি ধারণার সমন্বয় করলে রেজিলিয়েন্সকে খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজন দুভাবেই দেখা বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

রেজিলিয়েন্সের পাশাপাশি সুন্দরবন অঞ্চলের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ কৃষক পরিবারগুলোর রেসপন্স বা প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য 'রেশনাল পিজেন্ট বিহেভিয়ার' বা 'কৃষকের যৌক্তিক আচরণ, প্রত্যয়টিও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাধারণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকদের মতো প্রান্তিক চাষীদের আচরণ নিয়েও আছে ব্যাপক বিতর্ক। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের মতো তাত্ত্বিকেরা দক্ষিণ এশিয়ার কৃষকদের বিশেষ করে বাংলাদেশের কৃষকদের প্রকৃতির পাশাপাশি রাষ্ট্র ও ক্ষমতাধরদের শিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের কৃষকদের 'আলুর বস্তা' উপমা দ্বারা অনেকটা নির্বোধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যাদের রাজনৈতিক ও শ্রেণি সচেতনতা একেবারেই শূন্যের কাছাকাছি (Duggett, 1975; Marx, 1978a, 1978b, 1987; Marx & Engles, 1978c)। পাশাপাশি এদের 'এশিয়াটিক' এবং 'ওরিয়েন্টাল' বলেও অনেকটা নিষ্ক্রিয় বা নির্জীব হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে (Wittfogel, 1953)। ভিন্ন ধারণাগত স্কুলের অন্তর্গত তাত্ত্বিকরা এশিয়ার তথা ভারতবর্ষ ও বাংলার কৃষকদের এতটা নিষ্ক্রিয়, নির্জীব হিসেবে চিন্তা না করে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সক্রিয় আচরণের অধিকারী হিসেবে দেখেছেন। এদের 'নৈতিকতা বা আদর্শিক অর্থনীতিবিদ (moral economist)' নামে অভিহিত করা হয়। তারা কৃষকদের আচরণ দেখেছেন নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং নাম দিয়েছেন 'safety first principle' (Lipton, 1969; Popkin, 1979, 1980; Scott, 1976; Wolf, 1969)। এরাই এশিয়ার কৃষকের 'যৌক্তিক আচরণকে' প্রান্তিক উৎপাদনের ভিত্তিতে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। তাদের মতে, প্রান্তিক কৃষকেরা তাদের পরিবারের ভরণপোষণকে বাজার বা লাভের চেয়ে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এটাই তাদের জন্য 'রেশনাল বা যৌক্তিক।' এ ক্ষেত্রে কৃষকদের মূল ভাবনা থাকে তাদের উৎপাদন সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা সব সময় কাজ করে। ভারতবর্ষের কৃষির আবিষ্কার, যা নিওলিথিক যুগে শুরু হয়েছে তা থেকে পরবর্তীকালে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও সবুজ বিপ্লবের মতো তিনটি বড় ঘটনার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে কৃষকদের এই 'safety first principle' তাদের যৌক্তিক আচরণ হিসেবে প্রতিভাত হয় (Bose, 1999; Wood, 2003; Guha, 1986; Popkin, 1979; Majumder, 1971; Hazarika, 2006; Schendel, 2009; Alamgir, 1980; Sen, 1981; Greenough, 1982; Ray, 1973)।

এই গবেষণার মূল প্রশ্ন হলো, সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকরা শক্তিশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কতটুকু রেজিলিয়েন্ট এবং এটা ভবিষ্যৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের কতটুকু সহায়ক হবে?

৩। গবেষণা পদ্ধতি

উপরের গবেষণা প্রশ্নটির উত্তর সন্ধানে এ গবেষণাতে পরীক্ষামূলক (experimentalism) গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে সংখ্যাতাত্ত্বিক (quantitative) ও গুণাত্মক (qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার স্থান হিসেবে সাইক্লোন আইলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা জেলাকে নির্বাচন করা হয়। এ জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি উপজেলার একটি হলো শ্যামনগর উপজেলা। এ উপজেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের দুটি গ্রাম হলো গড়কুমারপুর ও মোল্লাপাড়া। এ দুটি গ্রাম নির্বাচনের যৌক্তিকতা হলো এগুলোর ক্ষয়ক্ষতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। গড়কুমারপুর গ্রামটি খলপেটুয়া ও কপোতাক্ষ নামক দুটি নদী দ্বারা বেষ্টিত এবং মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপাঞ্চল, যা ৭/১ নামক পোল্ডার দ্বারা সাইক্লোন আইলার পূর্বে লোনাপানির জলোচ্ছাস থেকে কিছুটা সুরক্ষিত ছিল। পোল্ডার হলো একটি ডাচ টার্ম, এটি এমন একটি নিম্নাঞ্চলকে বোঝায়, যা বাঁধ দ্বারা সমুদ্রের বা নদীর জোয়ারের পানি থেকে সুরক্ষিত হয়। এ বাঁধগুলো পুরো ভূখণ্ডকে জোয়ারের সময় লবণাক্ত পানি থেকে সুরক্ষা দেয়। কিন্তু ভেতরের বৃষ্টির পানি যেন নদীতে ভাটার সময় বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য খাল দিয়ে নদীর সাথে সংযুক্ত থাকে এবং খালের মুখগুলো রেগুলেটর বা গেট দিয়ে জোয়ারের সময় বন্ধ থাকে ও ভাটার সময় খোলা থাকে। গড়কুমারপুর গ্রামের পুরো মাটির বাঁধটি সাইক্লোন আইলায় ধসে গিয়ে পুরো দ্বীপ এলাকার কৃষি ও চিংড়ি চাষের জমিগুলো জোয়ারের লোনা পানিতে ভেসে যায়। এ লবণাক্ততার জন্য বাঁধ সংস্কারের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় তিন বছর এ অঞ্চলে কৃষি ও চিংড়ি চাষ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত অপর গ্রামটি হলো মোল্লাপাড়া। সাইক্লোন আইলার পূর্বে এটিও পোল্ডার নং ৫ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল । তবে এ গ্রামটি মূল ভূখণ্ডের সাথে সড়কপথে সংযুক্ত। ফলে উপজেলা থেকে সকল ত্রাণ এ গ্রামে এসে তারপর নৌকায় নদী পার হয়ে গড়কুমারপুরে যেতো। মোল্লাপাড়ার জনগণ সাইক্লোনের পূর্বেই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অর্থনৈতিকভাবে অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। এছাড়া পোল্ডার ৫ বাঁধটি একটি নদী (খলপেটুয়া) দ্বারা ঘূর্ণিঝড়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গ্রামে অবস্থিত নওয়াবেকী গণমুখী ফাউণ্ডেশন নামক এনজিওর নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা উদ্যোগী হয়ে বাঁধের কয়েকটি ভাঙা অংশ মেরামত করায় ঝড়ের ছয় মাসের মধ্যেই কৃষিকাজ পুনরায় সীমিত আকারে শুরু করতে পেরেছিল।

সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে মোল্লাপাড়া গ্রামের ২৯৩টি খানা ও গড়কুমারপুর গ্রামের ৫৫৭টি খানা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শুধু সংখ্যাতাত্ত্বিক বিষয়গুলো উঠে আসে। কিন্তু ত্রাণ ও বাঁধ নিয়ে দুর্নীতির মতো বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পাশাপাশি অভিবাসন এবং ইটভাটা ও মাটিকাটার কাজে দালাল বা মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা পুরোপুরি তুলে ধরার জন্য গুণগত উপাত্তের প্রয়োজন। এ জন্যই দীর্ঘস্থায়ী অভিবাসী পরিবার ও তাদের আত্মীয়স্বজন, চিংড়ি ব্যবসায়ী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা, ত্রাণ কাজের সাথে জড়িত কর্মী, এনজিও কর্মী, ব্রিকফিল্ড কন্ট্রাক্টর ও মাটি কাটার কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং আইলার পর যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ও যশোরে চলে গিয়েছিল, তাদের অভিবাসন স্থলে গিয়ে কেস

স্টাডির জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ ছাড়াও ভারতে স্থায়ীভাবে অভিবাসী যেসব পরিবারের যে কয়েকজন সদস্য সময়ে সময়ে দেশে এসেছিল, তাদের নিবিড় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এভাবে মোট ৭২টি নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

৪। গবেষণা ফলাফল

৪.১। কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের সক্ষমতা

কৃষকেরা আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে আদৌ সক্ষম কি না জানার জন্য তারা দীর্ঘমেয়াদে কি কি আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তা দেখা দরকার। ভারতবর্ষের কৃষির উৎপত্তি কাল (নিওলিথিক যুগ) থেকে ১৯৭০ এর দশকে ও পরবর্তীকালে সংঘটিত সবুজ বিপ্লব পর্যন্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কৃষকদের কখনও নিষ্ক্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বরং তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সক্রিয়ভাবে যে কাজ করে, তা প্রতীয়মান হয়। সে সময়ে তাদের আচরণ 'বণ্ডেড রেশনালিটি' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (Frankel, 1971, Mazhar, 2009, Majumder, 1971, Hazarika, 2006, Scheudel, 2009)। সব সময় তারা উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিল, যদিও কৃষকেরা কখনও কখনও উৎপাদন অধিক বৃদ্ধি করতে ভেজাল সার ব্যবহারের মতো ভুল জালে জড়িয়েছে (Frankel, 1971)।

অনেক সময় বাইরে থেকে আসা প্রযুক্তি প্রথমে তাদের কাছে জটিল মনে হলেও তারা ধীরে ধীরে সে প্রযুক্তি আয়ত্তে নিয়ে উৎপাদন ঠিকই বাড়িয়েছে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাংলাদেশে 'সবুজ বিপ্লব।' কৃষকদের 'যৌক্তিক আচরণ' বা 'রেশনাল বিহেভিয়ার'-এর উদাহরণ বাংলার সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়ও লক্ষ করা যায়। সে সময়ে প্রচুর সংখ্যক কৃষক খাদ্যের অভাবে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে পাড়ি জমাতে থাকে। তাদের কাছে কলকাতা শহরের ধারণক্ষমতা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য না থাকায় লাখ লাখ অভুক্ত ভবঘুরে কলকাতা শহরে ঘুরতে থাকে। এ দুর্ভিক্ষের জন্য Sen (1981), Alamgir (1980) ও Greenough (1982) এর মতো অর্থনীতিবিদরা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ভ্রান্ত নীতিকে দায়ী করেন।

কলকাতা শহরে অভুক্ত ও রোগাক্রান্ত ভবঘুরের সংখ্যা অক্টোবর ১৯৪৩ সালে প্রায় এক লাখে পৌঁছে। খাদ্যত্রাণ এতই অপর্যাপ্ত ছিল যে কলকাতা শহরে যত্রতত্র অনেক অজানা লোকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়: 'অক্টোবর মাসেই ত্রাণকর্মীরা প্রায় ৩,৩৬৩ জন অজানা লোকের লাশ সৎকার করে...' (Sen, 1981)। এ সময়ে সরকারি কৃষি সেবাও এতটা অপ্রতুল ছিল যে কৃষকেরা ঘুরে দাঁড়াতে যথেষ্ট সাহায্য-সহায়তা পায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারি কৃষি সেবা অনেকটা সম্প্রসারিত হয়। ফলস্বরূপ কৃষকেরা নতুন জ্ঞান দ্রুত আত্মস্থ করে 'সবুজ বিপ্লবকে' সার্থক করে তোলে।

৪.২। কৃষকের রাজনীতি সচেতনতা

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও তাদের অনুসারীরা ভারতীয় কৃষকদেরকে 'আলুর বস্তা'-র সাথে তুলনা করে তাদের অসচেতন হিসেবে তুলে ধরেন, যারা কখনোই রাজনীতি সচেতনতার মাধ্যমে বিপ্লব করতে পারবে না। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ আন্দোলনেই বাংলার

কৃষকেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও কৃষক ও তাদের সন্তানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতার বড় উদাহরণ হয়ে আছে। এ থেকে বোঝা যায়, কৃষকদের আচরণ রাজনৈতিকভাবে 'যৌক্তিক' বা 'রেশনাল' ছিল, যে রেশনালিটির কথা বিবৃত হয়েছে De Jonge (2012), Shahabuddin (1991), Scott (1985, 2009) প্রমুখের আলোচনায়। তবে কৌশলগত কারণে রেশনালিটি অনেক সময়ে 'বণ্ডেড রেশনালিটি'-তে রূপ নেয়, যেখানে কৃষকের কাছে তার পরিবারের 'সেইফটি ফার্স্ট' হাইপোথিসিসটিই টিকে থাকার প্রধান রেশনাল আচরণ হয়ে উঠে (Lipton, 1969; Popkin, 1979; Scott, 1976; Wolf, 1969)। পরিবারের এ ধরনের নিরাপত্তার অগ্রাধিকার আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও পাব। এটা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতারই অংশ। এ জন্য তারা সময়ে সময়ে স্থানীয় প্রভাবশালী গ্রুপগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

৪.৩। স্থানীয় ক্ষমতাসীন গ্রুপের সাথে কৃষকদের সংযোগ বা সমঝোতা

সাইক্লোন আইলায় গড়কুমারপুর গ্রামের বাঁধ পুরো ভেঙ্গে যাওয়ায় স্থানীয় কৃষি ও চিংড়ি চাষ একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় ছয় মাস ত্রাণ কার্যক্রম চললেও পরবর্তীকালে তা রূপান্তরিত হয় স্থানীয় ছোট ছোট বাঁধে মাটি কাটার কাজে। এ সময় দেখা যায়, স্থানীয় কৃষক পরিবারগুলো তাদের পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্কগুলো ব্যবহার করতে থাকে স্থানীয় শক্তিশালী গ্রুপগুলোর সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে, যা তাদেরকে মাটি কাটার কাজ পেতে সহায়তা করে। অনেক সময় স্থানীয় প্রভাবশালীদের ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমেও সম্পর্ক রেখেছে কাজ পাওয়ার জন্য। সেটা তাদের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য 'সেইফটি ফার্স্ট' হাইপোথিসিসকেই প্রমাণ করে। গড়কুমারপুর ও মোল্লাপাড়া গ্রামের অনেক কৃষকপরিবার মাটি কাটার কাজের পাশাপাশি ঢাকা, যশোর ও খুলনা শহরে ইট ভাটার কাজেও চলে যায়। এ ক্ষেত্রে মোল্লাপাড়া গ্রামে অবস্থিত ইট ভাটায় শ্রমিক যোগানে নিয়োজিত সমিতি তাদের সহযোগিতা করে। এটি তখন কৃষকদের কাজ পাবার ভরসাস্থল হয়ে উঠে। ইটভাটার কাজ ছিল তিন থেকে ছয় মাসের জন্য। কিছু কিছু কৃষক পরিবার তাদের আত্মীয় সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে অভিবাসিত হয়, যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে অভিযোজন হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। আর তাদের মাটি কাটার কাজ ও ইটভাটার কাজকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে কোপিং হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (চিত্র-১,২,৩ ও ৪)।

চিত্র ১: সাইক্লোন আইলার পূর্বে গড়কুমারপুর গ্রামের পেশাগত চিত্র

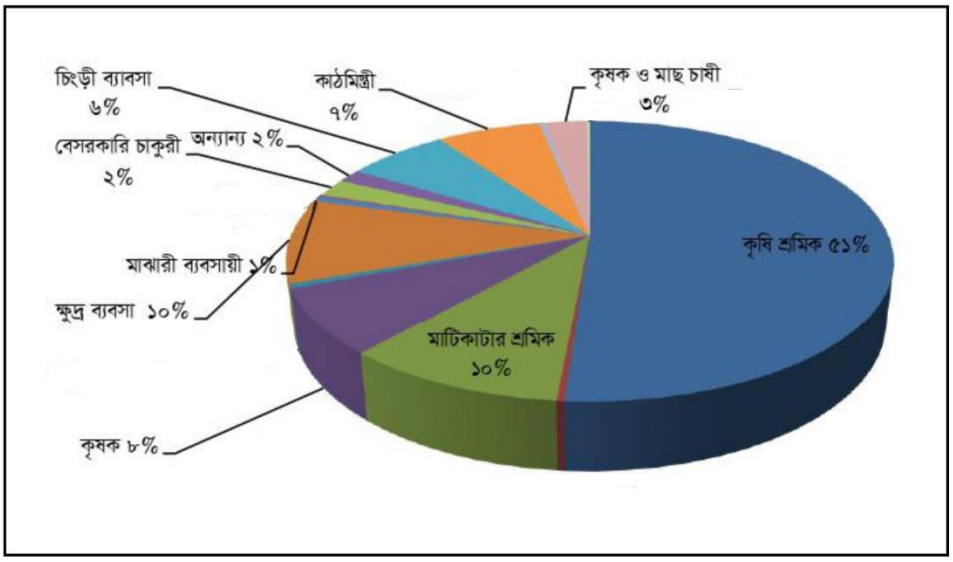

চিত্র ২: সাইক্লোন আইলার পরে গড়কুমারপুর গ্রামের পেশাগত চিত্র

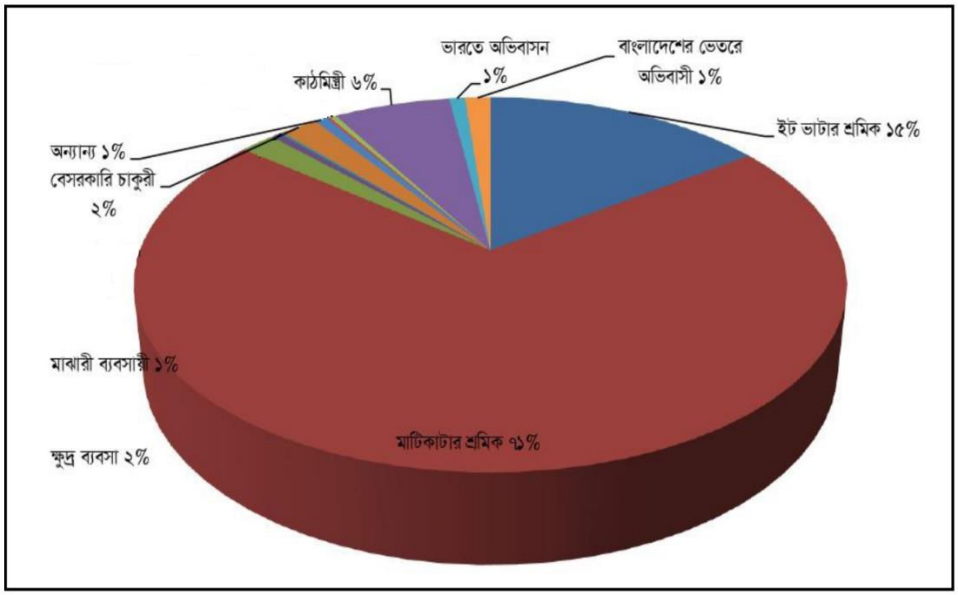

চিত্র ৩: সাইক্লোন আইলার পূর্বে মোল্লাপাড়া গ্রামের পেশাগত চিত্র

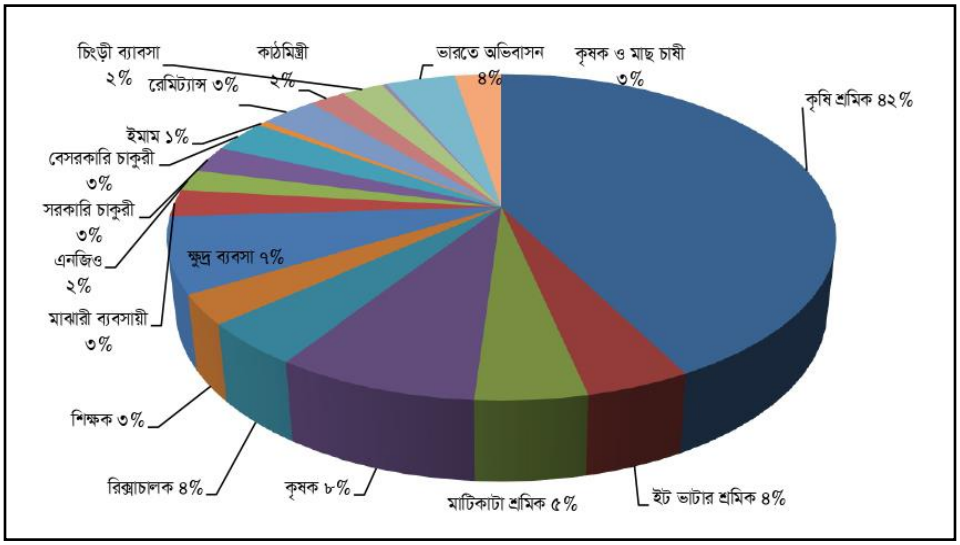

চিত্র ৪: সাইক্লোন আইলার পরে মোল্লাপাড়া গ্রামের পেশাগত চিত্র

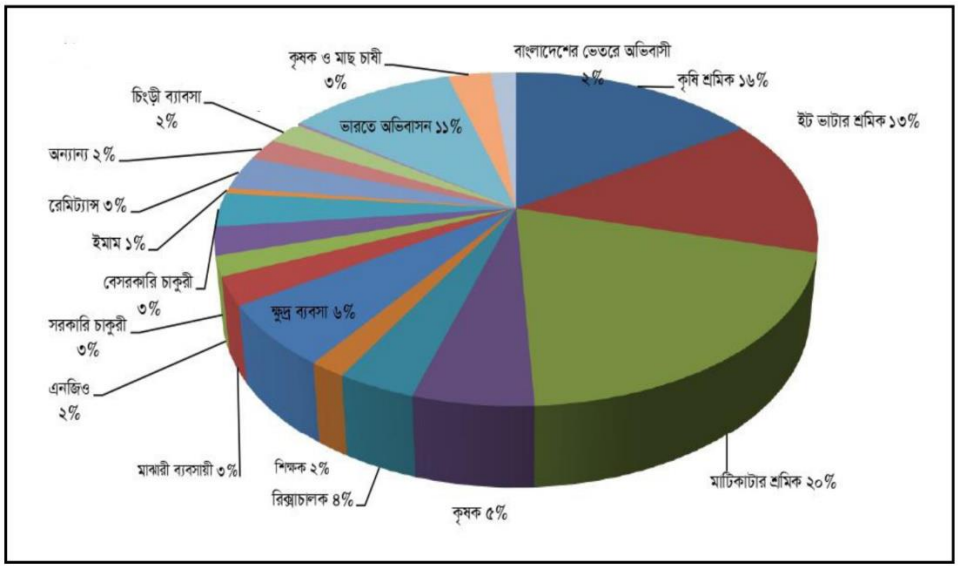

গড়কুমারপুর ও মোল্লাপাড়া গ্রাম থেকে কয়েকটি পরিবার আবার স্থানীয় দালালদের সহায়তায় ভোমরা স্থলবন্দর অতিক্রম করে ভারতের কলকাতা শহরের বস্তিতে কাগজ কুড়ানোর কাজ শুরু করে। এ স্থায়ী অভিবাসনও কৃষক পরিবারগুলোর দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজনকেই নির্দেশ করে (Wood, 2003)। সেখানে গিয়ে তারা স্থানীয় বস্তির বড় ভাইদের অর্ধেক দামে কাগজ প্রদানের মাধ্যমে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটিকে Wood (2003) প্রভাবশালীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্রদের টিকে থাকার বা নিরাপদ থাকার একটা কৌশল মাত্র মনে করেন। এটাও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদে পড়া কৃষক পরিবারগুলোর 'বণ্ডেড রেশনালিটির' প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি এটা প্রভাবশালী গ্রুপের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের টিকে থাকা নির্দেশ করে, কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ কতটা টেকসই হবে সে প্রশ্নটা থেকেই যায়।

৪.৪। সাইক্লোন আইলায় কৃষকদের প্রতিক্রিয়ার স্থায়ীত্ব

মোল্লাপাড়া ও গড়কুমারপুর গ্রাম জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, মোল্লাপাড়া গ্রামের চেয়ে গড়কুমারপুর গ্রামের কৃষক পরিবারগুলো অধিক দুর্যোগপ্রবণ। গড়কুমারপুরের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এর বড় একটি কারণ।

সারণি ১: মোল্লাপাড়া ও গড়কুমারপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রত্যয়	মোল্লাপাড়া	গড়কুমারপুর	মোট
পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা	৪.৬১	৩.৯৩	৪.১৬
পরিবারের উর্পাজনক্ষম গড় সদস্য সংখ্যা	১.৩০	১.০৬	১.১৪
সম্পূর্ণ ভূমিহীন (০-০.৪ শতাংশ জমি)%	৩.০৭	২.৮৭	২.৯৪
প্রান্তিক ভূমিহীন (০.৫-৪৯ শতাংশ জমি)%	৬২.১২	৭৬.৪৮	৭১.৫৩
ক্ষুদ্র কৃষক (৫০-৯৯ শতাংশ জমি)%	১০.৯২	১০.৭৭	১০.৮২
মাঝারি কৃষক (১০০-২৪৯ শতাংশ জমি)%	১৫.৭	৯.৩৪	১১.৫৩
বৃহৎ/ধনী (২৫০+ শতাংশ জমি)%	৮.১৯	০.৫৪	৩.১৮

মোল্লাপাড়া গ্রামে পরিবার প্রতি গড় সদস্যসংখ্যা ৪.৬১ জন এবং উপার্জনক্ষম সদস্যসংখ্যা ১.৩০, যা গড়কুমারপুর গ্রামের গড় উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যার চেয়ে বেশি (সারণি ১)। এ সারণি থেকে আরও দেখা যায়, মোল্লাপাড়া গ্রামের প্রান্তিক ও সম্পূর্ণ ভূমিহীন পরিবারের তুলনায় গড়কুমারপুর গ্রামে প্রান্তিক ও সম্পূর্ণ ভূমিহীন পরিবারের শতকরা হার বেশি, যেটি গড়কুমারপুর গ্রামে বসবাসকারী অধিবাসীদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা নির্দেশ করে। একইসাথে মোল্লাপাড়া গ্রামে ধনী বা বৃহৎ মালিকের হার গড়কুমারপুর গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি (সারণি ১)। এ চিত্রগুলো এ দুটি গ্রামের অর্থনৈতিক পার্থক্যের সুস্পষ্ট নির্দেশক। ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবার পর গড়কুমারপুর গ্রামের কৃষকদের দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার স্বল্পমেয়াদি মোকাবিলা (কোপিং) কৌশল বা উপায় ছিল স্থানীয় অঞ্চলে মাটি কাটার কাজ (চিত্র ২)। কিন্তু জরিপ ও কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, সেটা কৃষক পরিবারের টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট ছিল না (সারণি ২)।

সারণি ২: সাইক্লোন আইলার পর একটি কৃষক পরিবারের ৮৯৮ দিনে আয়-ব্যয়ের চিত্র

উৎস	সুশীলন ও ওয়ার্ল্ডভিশন	ইউএনডিপি	সর্বমোট
দৈনিক মজুরি (টাকা)	১৫০	১৭৫	
সর্বমোট কাজের দিন	২০১	৩০	
সর্বমোট আয় (টাকা)	৩০,১৫০	৫,২৫০	৩৫,৪০০
৮৯৮ দিনে পরিবারের ব্যয়/চাহিদা (৮,০০০ টাকা মাসিক ধরে)			২৩৯,৪৬৬
আয়-ব্যয়ের পার্থক্য (টাকা)			২০৪,০৬৬

উৎস: গড়কুমারপুর গ্রামে রিয়াজউদ্দীনের সাক্ষাৎকার, ১০ নভেম্বর ২০১১।

এমনকি মোল্লাপাড়া গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকা অবস্থায়ও সেখানে মাটি কাটার কাজ কৃষক পরিবারগুলোর টিকে থাকার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। রিয়াজউদ্দীন সাইক্লোন আইলার পর মাটি কাটা কাজের আয়ের এবং ৮৯৮ দিনের সর্বমোট ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন (সারণি ২)। এতে দেখা যায়, তিনি প্রায় ২৩১ দিন মাটি কাটার কাজ করে ৩৫,৪০০ টাকা রোজগার করেন, যা তার পাঁচ সদস্যের পরিবারের খাবার যোগানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। মাসে আট হাজার টাকা খরচ ধরে হিসাব করলে এ সময়ে পেটপুরে তিনবেলা খেতে তার প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৬৬ টাকা প্রয়োজন। এ বিপুল ঘাটতি মোকাবিলায় তিনি ও তার পরিবার দুইবেলা বা একবেলা খেয়ে কাটিয়েছে। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় এনজিওর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। এ ঋণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কৃষক পরিবারগুলো থেকে সামর্থ্যবান এক বা দু'জন করে সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলের বাইরে ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে ছয় মাসের জন্য ইটভাটার কাজে গিয়েছিল (চিত্র ২ও ৪)। কিন্তু একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি ইটভাটায় অসুস্থ হলে সে উপার্জনও ব্যাহত হচ্ছিল। বর্ষাকালে বেশির ভাগ ইটভাটা পানিতে তলিয়ে যায় এবং বন্ধ থাকে। ফলে পরিবারগুলো আবার এনজিও বা আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যে সকল পরিবার সাময়িক কাজের জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়েছিল তাদের প্রায় সবাই পূর্ববর্তী ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আরও বেশি ঋণ করেছিল। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, এদের মধ্যে ২৫ শতাংশ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করেছিল, ৬.২৫ শতাংশ জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিয়েছিল এবং বাকী প্রায় ৬২.৫ শতাংশ ঋণ নিয়েছিল এনজিওদের কাছ থেকে। এ ঋণের পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন দুই হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা। কাজেই দেখা যায়, কম খাওয়ার পাশাপাশি ঋণগ্রস্ততা হয়ে উঠেছিল কোপিংয়ের একটি মাধ্যম।

এ ফলাফল বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনের ফলাফলকেও সমর্থন করে '...বাংলাদেশে অস্থায়ী অভিবাসীরা তাদের আয়ের ৬০ শতাংশই তাদের গ্রামে রেখে আসা পরিবারগুলোকে পাঠায়' (World Bank, 2009)। কিন্তু এ ধরনের অভিবাসন কেন প্রয়োজনীয়? কেন মোল্লাপাড়া বা গড়কুমারপুরের কৃষকরা তাদের নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারে না? কেন তাদের প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত যেতে হয়? সুন্দরবন অঞ্চলের দারিদ্র্য ও জীবিকা নির্বাহের উপায়গুলোই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার উত্তম উপায়। প্রথমত, এ অঞ্চলের অধিকাংশেরই ইটভাটা স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজি নেই। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সামর্থ্য নেই ইট দিয়ে ঘর তৈরি করার। তাই ইটের চাহিদাও অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে কম। রাষ্ট্রও এ অঞ্চলে এমন কোনো বৃহৎ

শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়নি, যা অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারে। পাশাপাশি জরিপের ফলাফল এবং গুণগত উপাত্ত থেকে দেখা গেছে, সাইক্লোনের পূর্বে চিংড়ি চাষের মুনাফা মূলত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হস্তগত হয়েছে। সাইক্লোন আইলার পর সে চিংড়ি চাষও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় পোল্ডারের বাধগুলো ভেঙে জোয়ারের পানি প্রবেশের ফলে।

স্বল্পমেয়াদি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, কৃষক পরিবারগুলো ধীরে ধীরে উপার্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ফলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের মতো মৃত্যু এ অঞ্চলে দেখা যায়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এ অঞ্চলের কৃষকেরা রেজিলিয়েন্ট। কিন্তু এ রেজিলিয়েন্স পুনর্গঠিত হয়েছে দারিদ্র্যতা, ঋণগ্রস্ততা ও কম খাবারের মাধ্যমে।

তাহলে কৃষক পরিবারের মধ্যে যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে অভিবাসিত হয়েছিল তাদের অভিযোজন/এডাপটেশন কতটুকু হয়েছে? স্থায়ী অভিবাসন সব সময়ই একটি কঠিন অভিযোজন কৌশল। প্রথমত, স্থানান্তরে বড় ধরনের খরচ জড়িত থাকে। দ্বিতীয়ত, নতুন স্থানে খাপ খাওয়ানোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। পাশাপাশি এ গবেষণায় স্থায়ী অভিবাসনের মানসিক দিকটিও পুরোপুরি পরিমাপ করা যায়নি, যেমন আমরা দেখি কলকাতায় অভিবাসিত পরিবারটির মা শুধু মেয়েদের বিয়ের কথা চিন্তা করে তার তিন মেয়েকে নিয়ে পূর্বপুরুষের ভিটেয় চলে আসে স্বামী ও উপার্জনক্ষম ছেলেকে বিদেশে রেখে। এ ধরনের মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যের পরিমাপ সত্যিই দূরূহ। কিন্তু এটা বলা যায়, স্থায়ী অভিবাসন তাদের ভবিষ্যৎ দুর্যোগপ্রবণতা বা লবণ পানিতে তলিয়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষা দিয়েছে; যদিও এটি রেজিলিয়েন্সের একটি খুব সংকীর্ণ ব্যাখ্যা।

পাশাপাশি যে পরিবারগুলো চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে স্থায়ীভাবে অভিবাসিত হয়েছে, তারা সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্যোগপ্রবণতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে এ অভিবাসন চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলের বাঙালিদের সাথে আদিবাসীদের দ্বন্দ্বকে যে উসকে দিবে না বা নতুন দ্বন্দ্ব তৈরি করবে না, তা বলা যায় না (Adnan & Dastidar, 2011)। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক যখন পাহাড়ী অঞ্চলে অভিবাসিত বাঙালি পরিবারগুলোর সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার পরিচালনা করে, তখন তারা নতুন স্থানে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে খুবই উচ্ছাস প্রকাশ করে। সাইক্লোন আইলার তিন বছরের মধ্যেই তারা সকল ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, যার মধ্যে ছিল স্থানান্তরিত হবার জন্য করা ঋণও। কিন্তু এ কেস স্টাডিগুলোর সাফল্য স্থানীয় আদিবাসীদের ভোগান্তির বৃহত্তর চিত্র দিয়ে বিচার করতে হবে, কেননা এই কেস স্টাডিগুলো পুনরায় 'বণ্ডেড রেশনালিটির' একটি জোরালো উদাহরণ তৈরি করে।

অভিবাসিত বাঙালি পরিবারগুলো সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের পারিবারিক জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে অনেক কম মূল্যে পাহাড়ী অঞ্চলে আদিবাসীদের নিকট থেকে জমি কিনে চাষবাস শুরু করে। এক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহায়তাও পায়। তারা পূর্বে আসা বাঙালিদের কাছ থেকে রেশন কার্ড ক্রয় করেছে, যার মাধ্যমে সরকার থেকে রেশন সাহায্য পাচ্ছে। কিন্তু এ জমি (যেটা তারা পাহাড়ে ক্রয় করেছে) তারা সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করে নিতে পারেনি ১৯৯৭ সালে আদিবাসী ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির কারণে। এ চুক্তির জন্য আদিবাসী বা কেউই এ পার্বত্য জেলাগুলোতে ভূমি কমিশন না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে জমি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না।

বর্তমানে গবেষণার কেস স্টাডিগুলোর মধ্যে পাঁচটি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির সাথে অভিযোজনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। কলকাতায় অভিবাসিত হওয়া আরও কিছু পরিবার কলকাতার রাস্তায় কাগজ কুড়ানো ও রিক্সা চালানোর মতো অমর্যাদাকর কাজের মাধ্যমে জীবনের সাথে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। যদি তাদের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করি, তাহলে গ্রামে নেয়া ঋণগুলো পরিশোধের ভিত্তিতে বলা যায়, তারা অভিযোজনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তারা কলকাতার বস্তিগুলোতে সামাজিকভাবে অনিরাপদ ছিল, যেখানে বস্তির বড় ভাইদের কর্তৃক আবার অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হচ্ছিল। কারণ বস্তির বড় ভাইদের কাছে তাদের কুড়ানো কাগজগুলো বিক্রি করতে হচ্ছিল প্রচলিত বাজার দরের অর্ধেকে আর এর বিনিময়ে বস্তির বড় ভাইরা তাদের পুলিশের হাত থেকে রক্ষাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বিধান করে। কিন্তু এটা যখন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা হয় তখন দেখা যায়, দক্ষিণ ইউরোপের শহরের তুলনায় (যখন ইউরোপ শহরায়ন ও শিল্পায়নের এ স্তরে ছিল) এশিয়ার শহরের বস্তিগুলোতে বা পুরো শহরে মৃত্যুহার অনেক কম এবং স্বাস্থ্যসেবা অনেক ভালো (World Bank, 2009)। এ ধরনের পার্থক্য মূলত আসে সামগ্রিকভাবে একটা অঞ্চলের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে। তুলনা করলে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার ইউরোপের চেয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোর অবস্থা অনেক ভাল। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর অভিবাসিত জনগণের জন্য এটা স্বস্তির জায়গা।

৪.৫। বর্তমান গবেষণায় কৃষকদের সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন

এ গবেষণার শুরুতে ধারণা ছিল না যে এটা এত বেশি সংখ্যক অস্থায়ী দৈনিক কর্মজীবীও অভিবাসীতে অভিসিক্ত হবে। এ জন্য এ গবেষণার প্রবন্ধ পর্যালোচনায় অভিবাসন বা অস্থায়ী দৈনিক কর্মজীবনের চেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে কৃষকের ধারণা এবং কৃষকরা আসলেই সে অবস্থায় রেশনাল বা যৌক্তিক আচরণ করে কি না সেগুলো। আর এ কারণেই প্রবন্ধ পর্যালোচনায় মূলত আলোকপাত হয়েছে কৃষকদের নিষ্ক্রিয় জীব হিসেবে মার্ক্সীয় আলোচনার ওপর। কিন্তু কৃষকদের এ নিষ্ক্রিয় অবস্থান দ্রুতই পরিবর্তিত হতে থাকে যখন বর্তমান লেখক James Scott (1985) এর 'The Weapons of the Weak' বইটি পড়ে। Scott (1985) দেখিয়েছেন, কিভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষক ও আদিবাসীরা নিজেদের শাসন অধিকার ফিরে পাবার পূর্ব পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিজেদের অভিবাসিত ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এ থেকে কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাদের এজেন্সি বিষয়ে বর্তমান লেখকের ধারণার আমূল পরিবর্তন হতে থাকে। এ পরিবর্তনে মূলত Guha (1983), Bose (1999) এবং Wood (2003) এর লেখাগুলো প্রভাবিত করে। ফলে যেখানে কার্ল মার্কস এশিয়ান কৃষকদের 'আলুর বস্তার' মতো জড় পদার্থের সাথে তুলনা করেন, সেখানে Guha (1986, 1988, 1983) ১৮৩২-র 'কোল বিদ্রোহ,' ১৯৪৬-৪৭-র 'তেভাগা আন্দোলন,' ১৯৪৭-৫১-র 'তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ,' ও 'কৃষাণ সভার' উদাহরণ থেকে বাংলার কৃষককে সক্রিয় এজেন্ট ও শ্রেণিঐক্যের প্রতীক হিসেবে স্থাপনে সক্ষম হন। আরও দেখান, গ্রামীণ দরিদ্ররা ও কৃষকরা তাদের সচেতনতা সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পারে এবং 'class for itself' হিসেবে ভূমিকা পালনে সক্ষম (Guha, 1986)। এক্ষেত্রে Guha, Bose এবং Wood-এর ধারণাগুলো Scott-এর ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান গবেষণাটির একটি বড় আবিষ্কার হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা ও অভিযোজনে সাতক্ষীরা অঞ্চলের কৃষকদের সক্রিয় এজেন্সির প্রকাশ। এ ধরনের অভিবাসনের বিষয়ে World Bank (2009) এর 'World Development Report: Reshaping Economic Geography' তেও উল্লেখ আছে। এ প্রতিবেদনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের অভিবাসনের কিছু বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের সাথে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান, যে জন্য অভিবাসন প্রয়োজন। এ প্রতিবেদন দেখিয়েছে, কীভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের উন্নত অর্থনীতিগুলোর বিকাশে অভিবাসন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে (World Bank, 2009)। চীনের ডিজিংপিয়াও এর সংস্কারের সাফল্য সে দেশের পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রবর্তী এলাকা থেকে কৃষকদের শহরে অভিবাসনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশেও গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন উন্নয়নের সমার্থক। অন্য কথায়, বাংলাদেশে দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে অভিবাসন সক্রিয় অবদান রেখেছে (Siddiqui, 2003)। গবেষণা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে শহর থেকে গ্রামে পাঠানো রেমিটেন্সের ৮০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ ব্যয় হয় জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে এবং স্থানীয় উন্নয়নে এটার বহুমাত্রিক প্রভাব আছে (Afsar, 2003)। পাশাপাশি এ রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় নতুন বাসগৃহ নির্মাণে (টিনের বাড়ি থেকে বিল্ডিং করতে) (Afsar, 2003)। এ ধরনের ব্যয় স্থানীয় কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

মাওয়ের সময়ে চীনে লক্ষ লক্ষ কৃষককে শিক্ষার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দিয়ে শহরাঞ্চলে অভিবাসনে সহযোগিতা করা হয়, বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বসবাসকারী কৃষকদের ক্ষেত্রে যা প্রায় অসম্ভব (Bagchi, 2007)। চীনে ১২০ থেকে ১৫০ মিলিয়ন কৃষক গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসিত হয়েছিল। এর হার বাংলাদেশে সে তুলনায় খুবই কম (Nielson et al., 2007)। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিবাসনের ইতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে অতিসরলকীরণ করার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে। দরিদ্র লোকজন অনেকটা বাধ্য হয়েই তাদের পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাতে নতুন স্থানে যেতে বাধ্য হয়। এ গবেষণায় সকল অভিবাসিত পরিবারই এই শ্রেণিতে পড়ে। যে সকল পরিবার সাইক্লোন আইলার পর যশোর, ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কলকাতার উদ্দেশ্যে পৈত্রিক গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, তাদের সকলেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা খুবই নিম্নমানের। এ ক্ষেত্রে সরকার যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে পারে তাহলে এ পুশ বা তাড়িত অভিবাসনগুলো রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে (World Bank, 2009)। বাংলাদেশ ও ভারতে এ ধরনের উন্নতমানের অভিবাসন শেষ পর্যন্ত ত্বরান্বিত করবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা। কিন্তু এ গবেষণায় উল্লেখিত দুটি গ্রামেই সংঘটিত তাড়িত অভিবাসন এ মান থেকে নিম্নস্তরের।

সুন্দরবন অঞ্চলের মাঠ গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কাজের সুযোগের অভাব, বিশেষ করে দুর্যোগকালীন কাজের সুযোগের স্বল্পতা। সাইক্লোন আইলা অধিকাংশ জনগণকেই কর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফলে তারা বাধ্য হয়েছিল কম মজুরির মাটি কাটা কাজের জন্য তুমুল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে। এটাও এধরনের 'বন্ডেড রেশনালিটির' প্রকৃত উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষক ও চিংড়ি চাষিরা এক সময় মাটিকাটার কাজে অতিরিক্ত শোষণ ও মজুরি প্রদানে বিলম্বের বা দীর্ঘসূত্রতার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে যে প্রতিবাদ করেছিল, সেটা তাদের 'শ্রেণি সচেতনতাকেই' নির্দেশ করে, যা Guha (1983) রচিত 'Subaltern Studies' এ দেখা যায় ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে 'তাড়িত অভিবাসন' যশোর, ঢাকা, কলকাতা ইত্যাদির মতো শহরগুলোকে সস্তায় অদক্ষ শ্রমিক পেতে সহযোগিতা করেছে। যার জন্য এ ধরনের মেগাসিটিগুলো একটা লেভেলের উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এ ধরনের অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার এ মেগাশহরগুলো টোকিও, ওয়াশিংটনের মতো উন্নত মেগাশহরগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে না।

গড়কুমারপুর ও মোল্লাপাড়া গ্রামের কৃষক পরিবারগুলোকে এ ধরনের তাড়িত অভিবাসনের পরিবর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অধিক রেজিলিয়েন্ট কীভাবে করা সম্ভব? এ ধরনের কৃষক পরিবারগুলোর সক্ষমতা আর কীভাবে বাড়ানো যায়? প্রকৃত অর্থে বললে, এত সংখ্যক কাজ হারানো লোককে কীভাবে স্থানীয়ভাবে কাজ দিয়ে সুরক্ষা দেয়া যায়, তা নিয়ে রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে। যাই করা হোক না কেন, দক্ষিণাঞ্চলের এ গ্রামগুলোকে লবণ পানির বন্যা থেকে বাঁচানোই হবে প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় বাঁধগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। এটা দুভাবে করা সম্ভব। প্রথমত, বর্তমান প্রযুক্তিগত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাঁধগুলোকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা ভাবতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন প্রযুক্তি জ্ঞান নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে, যা এ বাঁধগুলোকে আইলার মতো ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করে স্থানীয় কৃষকদের ফসলী জমি ও চিংড়ি চাষের ঘেরগুলোকে সুরক্ষা দেবে লোনা পানির বন্যা থেকে। এটি তাদেরকে ভবিষ্যতে সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেবে ।

বর্তমানে বাঁধগুলোকে আরও উন্নত করে হয়তো এটা করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় উঠে এসেছে কীভাবে স্থানীয় চিংড়ি চাষী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার দুর্নীতি বাঁধগুলোকে দুর্বল করে দেয়। স্থানীয় চিংড়ি চাষীরা নিজেদের ঘেরে লবণ পানি ঢোকানোর জন্য বাঁধের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টিকের পাইপ বসিয়ে ফুটো করে। আর এক্ষেত্রে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে তাদের সহযোগিতা করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট সংস্থার যোগসাজশে কন্ট্রাক্টর সঠিকভাবে বাঁধ মেরামত না করায় এমনিতেই বাঁধগুলো দুর্বল থাকে- এ চিত্রটি উঠে এসেছে নিবিড় সাক্ষাৎকারকালে (Bhuyan, 2013)। এ ধরনের দুর্নীতির ফলস্বরূপ ২০০৯ সালে সাইক্লোন আইলার সময় গড়কুমারপুর গ্রামকে বেষ্টনকারী খলপেটুয়া নদী জলোচ্ছ্বাসের সময় পোল্ডার ৭/১ এর বাঁধটি বিভিন্ন স্থানে ভেঙে পুরো গ্রামটিই ভেসে যায় এবং গ্রামের লোকজন প্রাক্তন মেম্বারের দোতলা বাড়ি, স্থানীয় একতলা মসজিদের ছাদ ও আরেকটি একতলা বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করে (Bhuyan, 2013)। এ সময় সকল চিংড়ি ঘের ও কৃষিকাজের জমি লোনা পানির বন্যায় ভেসে যায়। পূর্ণিমার রাতে যখন নদী পূর্ণ জোয়ারে থাকে, তখন নদীর পানি ৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। সেখানে স্থানীয় মাঠগুলো থেকে একই উচ্চতায় নদীর পানি বিরাজ করে। সে সময় ফসলের সুরক্ষা হয় বাঁধগুলো দ্বারা। সুতরাং এ বাঁধগুলো ভবিষ্যতে আরও দু'মিটার উঁচু করে আরও শক্তিশালীভাবে নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু এ ভাঙ্গা বাঁধগুলো মেরামতের জন্য গ্রামবাসীদের সাইক্লোন আইলার পর দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ তিন বছর কৃষিকাজ করা পুরোপুরিই অসম্ভব ছিল (Bhuyan, 2013)।

অন্যদিকে মোল্লাপাড়া গ্রামটি সাইক্লোন আইলার সময় লবণ পানির বন্যা দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ গ্রামের প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে মূল বাঁধ অবস্থিত, যা পোল্ডার ৫ নামে পরিচিত। এ বাঁধটি মূলত স্থানীয় উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে এটি পোল্ডার ৭/১ এর চেয়ে অনেক মজবুত ও উঁচু। পাশাপাশি সাইক্লোনের রাতে স্থানীয় এনজিও নওয়াবেকী গণমুখী ফাউণ্ডেশণের উদ্যোগে কৃষকরা সংগঠিত হয়ে বাঁশ ও বালুর বস্তা দিয়ে কয়েকটি ফাটল মেরামত করেছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল এনজিওর দোতলা ভবন ছাড়াও আরও কয়েকজনের দোতলা বিল্ডিং থাকায় সেখানে পরিবার পরিজনদের রেখে পুরুষরা বাঁধ মেরামতে আত্মনিয়োগ করার ফলে। এনজিওটি এ ক্ষেত্রে অর্থের

যোগান দিয়েছিল (Bhuyan, 2013)। বাঁধ মেরামতের কারণে কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রামে চিংড়ি চাষ ও কৃষিকাজ হয়েছিল। তারপরও সাইক্লোন আইলার পরে গড়কুমারপুরের চেয়ে মোল্লাপাড়া গ্রাম থেকে অধিক কৃষক পরিবার অভিবাসী হয়েছিল যার মধ্যে অস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী দু'ধরনের অভিবাসী বেশি। এ গ্রামটির লোকজনের আর্থিক অবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকা এর একটি কারণ হতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ায় এ গ্রামের মানুষেরর পক্ষে অভিবাসন খরচ জোগাড় করা সহজ ছিল। ইটভাটার মালিক ছাড়াও অন্যান্য অভিবাসন সহযোগী দালালদের আনাগোনা এ গ্রামে বেশি ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সচ্ছল ও ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশিষ্ট গ্রামের কৃষকরা বিচ্ছিন্ন ও দরিদ্র গ্রামের কৃষকদের চেয়ে কম দুর্যোগপ্রবণ বা কম ঝুঁকিতে থাকে (Toufique & Yunus, 2013)।

৫। উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

ঘুষ ও দুর্নীতির বিষয়গুলো সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকদের জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাদের প্রাকৃতিক রেজিলিয়েন্সকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যেটা বাংলাদেশের দুর্বল শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামোর নির্দেশক, যদিও শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোকপাত করা এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। এ গবেষণার মূল প্রশ্ন ছিল কৃষকদের রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে কীভাবে তাদের জীবন-জীবিকা টেকসই করা যায়? এ ক্ষেত্রে যদি নতুন প্রযুক্তি আনা যায়, তা কৃষকদের রেজিলিয়েন্সে কীভাবে অবদান রাখতে পারে? এ ক্ষেত্রে তিনটি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

১) লবণাক্ত পানির বন্যা প্রতিরোধে অধিক শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ।

২) সুন্দরবন অঞ্চলে নতুন করে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ রোপণ, যা ভবিষ্যতে সাইক্লোন ও উপকূলীয় বন্যাকে প্রতিরোধ করবে।

৩) সাইক্লোন আইলায় লবণ পানির বন্যার ফলে যে লবণাক্ততা বেড়েছে তা কমানোর জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন।

নেদারল্যাণ্ড ও ভেনিসে এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প নেয়া হয়েছে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে নিচু ভূমি রক্ষা করার লক্ষ্যে (Batista, 2003; Karim, Van Meckoren, & Feenstra, 2004; Moel, Bouwer, & Aserts, 2014; Ribiere, 2001; Woldringh & New, 1999)। কিন্তু এ ধরনের উন্নত বৃহৎ প্রযুক্তি অত্যাধিক ব্যয়বহুল, যা হয়তো বাংলাদেশের মতো দেশের সামর্থ্যের বাইরে। সরকার চাইলে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রকল্পে অর্থসংস্থান বিষয়ে আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করতে পারে। বর্তমানে উপকূল অঞ্চলে যে ধরনের মাটির বাঁধ দেওয়া হয়, তা অনেকটা পুরনো ধাঁচের। বিশ্বব্যাংকও এ ধরনের গতানুগতিক পুরাতন প্রকল্পেই অর্থায়ন করে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সালে বিশ্বব্যাংক প্রথম বাংলাদেশের পোল্ডারগুলো তৈরিতে অর্থায়ন শুরু করে। জুন ২০১৩-তে এ মাটির বাঁধগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে অতিরিক্ত ৩৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করার পাশাপাশি ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করে (World Bank, 2013)। কিন্তু এতে কোনো ধরনের কৌশলগত উন্নয়ন সাধিত হয়নি। তবে এ ছাড়কৃত ফাণ্ড ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। বিশ্বব্যাংকের এ সকল অর্থায়ন শুধুই মাটির বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও বসতগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য, নেদারল্যান্ডস বা ভেনিসের মতো কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের জন্য নয়। এ অঞ্চলের লোনা পানির প্লাবন ঠেকানোর আরেকটা পন্থা হতে

পারে উপকূলীয় অঞ্চলে অধিক পরিমাণ ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ রোপণ করা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপর করা গবেষণা থেকে দেখা যায়, ম্যানগ্রোভ বন সাইক্লোনের সময় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের গতি ও উচ্চতা দুটিই কমাতে পারে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের উপকূলে সংঘটিত সুপার সাইক্লোন সিডরের ওপর পরিচালিত এক গবেষণা মতে, "১৫০ মিটারের মতো ম্যানগ্রোভ বনের ঘন অঞ্চল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ০.৮ মিটার পর্যন্ত হ্রাস করে" (Tanaka, 2008, cited in McIvor et al., 2012)। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বৃদ্ধি পায় ০.৭ শতাংশ, যা পরবর্তী দশকে (১৯৯০-২০০০) বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৩ শতাংশ (FAO, 2007)। ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ম্যানগ্রোভ বৃদ্ধি পায়নি। আমাদের এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নশীল হতে হবে। অনেক সময় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারক, মৌয়াল ও চিংড়ি চাষীদের দ্বারা ম্যানগ্রোভ বনের ক্ষতি হয়, যা এ অঞ্চলের দুর্যোগ ক্ষয়িষ্ণুতাকে বাড়িয়ে তোলে।

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, গড়কুমারপুর গ্রামের কৃষকদের জমির লবণাক্ততা প্রতিদিনের জলোচ্ছ্বাসের কারণে বেড়ে গিয়ে কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে গড়কুমারপুরের তুলনায় মোল্লাপাড়া কম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেখানকার কৃষকরা ফসলের উৎপাদনশীলতা কমে যাবার অভিযোগ করে। এ জন্য উন্নত বিশ্বে মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে ব্যবহার করা হয় জিপসাম ও প্রচুর জৈব উপাদান (Abdelfattah, 2012)। একইভাবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানও চেষ্টা করে যাচ্ছে লবণ সহনশীল শস্য উদ্ভাবনের, তবে এ অভিযোজন প্রক্রিয়া এখনও অনেকটা গবেষণা পর্যায়ে আছে। উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির স্বার্থে এ ধরনের উদ্ভাবন দ্রুত মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি আমাদের নীতিনির্ধারকদের যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, সাইক্লোন আইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় বা খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় কৃষকদের রেজিলিয়েন্স (সহনশীলতা) কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? গবেষণার ফলাফল থেকে এটা বলা যায়, সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষকরা রেজিলিয়েন্ট। সাইক্লোন আইলার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় তারা দ্রুত মাটিকাটা ও ইটভাটার কাজ নিয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজনের অংশ হিসেবে কিছু কৃষক পরিবার গ্রহণ করেছে স্থায়ী অভিবাসনের পথ। তাদের (কৃষকদের) নেয়া পদক্ষপগুলো ছিল 'লক্ষ্যকেন্দ্রিক ও অভিযোজন সহায়ক,' রেশনাল বা যৌক্তিক আচরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে কৃষকদের এই সহনশীলতার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল চিংড়ি ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় কর্মকর্তা ও ক্ষমতাধরদের দুর্নীতির কারণে, যা তাদের খাপ খাওয়ানোকে দীর্ঘায়িত করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কৃষকদের এই হাজার বছরের সহজাত রেজিলিয়েন্স ক্ষমতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও লালন করতে হবে। অন্যান্য গবেষণায়ও ব্যাপকভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাহায্য বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে (Karim & Noy, 2020)। কাজেই কৃষকদের এই রেশনাল আচরণ যেন চতুর্দিকের অশুভ শক্তির প্রভাবে 'বণ্ডেড রেশনালিটি'-তে পরিবর্তন না হয়, সেটার নিশ্চয়তা দিতে হবে রাষ্ট্রকেই।

গ্রন্থপঞ্জি

Abdel-Fattah, M. K. (2012). Role of gypsum and compost in reclaiming saline-sodic soils. *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 1*(3), 30-38.

Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? *Progress in Human Geography, 24*(3), 347-364.

Adnan, S., & Dastidar, R. (2011). *Alienation of the lands of indigenous Peoples in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. Dhaka: Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC) & International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

Afsar, R. (2003). *Internal migration and the development nexus: The case of Bangladesh.* Paper presented at the Migration, Development and Pro-Poor Policy Choices in Asia, Dhaka.

Alamgir, M. (1980). *Famine in South Asia: Political economy of mass starvation*. Cambridge: Oelgeschlager, Gunn & Hain, Publishers, Inc.

Amadore, L., Bolhofer, W. C., Cruz, R.V., Feir, R. B., Freysinger, C. A., Guill, S., & Wisniewski, J. (1996). Climate change vulnerability and adaptation in Asia and the pacific: Workshop summary. *Water, Air, and Soil Pollution, 92*(1-2), 1-12.

Bagchi, A. K. (2007). Workers and Migrants: China and India Circa 2005. In I. Nielsen, R. Smyth & M. Vicziany (Eds.), *Globalisation and labour mobility in China* (pp.151-168). Victoria: Monash Asia Institute, Monash University Press.

Batista, I. S. (2003). *A case study on the performance of embankments on treated soft ground*. (Master of Engineering), Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

Bhuyan, M. H. R. (2013). Corruption after the cyclone: A case study from Bangladesh. In A. Weigold & L. Brennan (Eds.), *Re-thinking India: Perceptions from Australia*. New Delhi: Readworthy Publications (P) Ltd.

Bose, S. (1999). Agricultural growth and agrarian structure in bengal: A historical overview. In B. Rogaly, B. Harriss-White & S. Bose (Eds.), *Sonar Bangla? agricultural growth and agrarian change in West Bengal and Bangladesh*. New Delhi: Sage Publications.

De Jonge, J. (2012). *Rethinking rational choice theory: A companion on rational and moral action*. New York: Palgrave Macmillan.

de Moel, H., Bouwer, L. M., & Aerts, J. C. (2014). Uncertainty and sensitivity of flood risk calculations for a dike ring in the South of the Netherlands. *Science of the Total Environment, 473-474*, 224-234.

Duggett, M. (1975). Marx on Peasants. *The Journal of Peasant Studies, 2* (2), 159-182.

FAO. (2007). *The world's mangroves 1980-2005*. Rome: FAO.

Frankel, R. (1971). *India's green revolution: economic gains and political costs*. New Jersey: Princeton University Press.

Government of Bangladesh. (2008). *Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, loss, and needs assessment for disaster recovery and reconstruction*. Dhaka: Ministry of Finance, Government of Bangladesh.

Greenough, R. (1982). *Prosperity and misery in modern Bengal: The famine of 1943-44*. New York: Oxford University Press.

Guha, R. (1983). The prose of counter-insurgency. In R. Guha (Eds.), *Subaltern studies II:Writings on South Asian history and society*. Delhi: Oxford University Press.

Guha, R. (1986). *Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India*. Delhi: Oxford University Press.

Guha, R. (1988). On some aspects of the historiography of colonial India. In G. C. Spivak & R. Guha (Eds.), *Selected subaltern studies*. New York: Oxford University Press.

Haque, U., Hashizume, M., Kolivras, K. N., Overgaard, H. J., Das, B., & Yamamoto, T. (2012). Reduced death rates from cyclones in Bangladesh: what more needs to be done? *Bulletin of the World Health Organization,* 90:150-156. Doi: 10.2471/BLT.11.088302.

Hazarika, M. (2006). Neolithic culture of northeast India: A recent perspective on the origins of pottery and agriculture. *Ancient Asia, 1*, 25-43.

IRIN. (2009). *Bangladesh: Cyclone Aila recovery slower than Sidr*. Retrieved 22 June 2010, from http://www.irinnews.org/report/85396/bangladesh-cyclone-aila-recovery-slower-than-sidr

Karim, A. & Noy, I. (2020). Risk, poverty or politics? The determinants of subnational public spending allocation for adaptive disaster risk reduction in Bangladesh. *World Development 129* (5):104901. DOI: 10.1016/j.worlddev.2020.104901.

Karim, U. F. A., Van Meekeren, H., & Feerstra, R. (2004). Settlement of a bridge embankment on soft soils. *Geotechnical Engineering, 157* (1), 9-12.

Lipton, M. (1969). The theory of the optimizing peasant. *Journal of Development Studies, 4*, 341.

Maitrot, M., Wood, G., & Devine, J. (2021). Understanding resilience: Lessons from lived experiences of extreme poverty in Bangladesh. *Development Policy Review, 39*(6), 894-910. https://doi.org/10.1111/dpr.12543.

Majumder, R. C. (1971). *History of Ancient Bengal*. Calcutta: G. Bharadwaj & Co.

Manyena, S. B. (2006). The concept of resilience revisited. *Disasters, 30*(4), 434-450.

Marx, K. & Engels, F. (1978). Address of the central committee to the communist league. In R. C. Tucker (Eds.), *The Marx Engels Reader*. New York: W. W. Norton & Company.

Marx, K. (1978a). The British Rule in India. In R. C. Tucker (Eds.), *The Marx Engels reader*. New York: W. W. Norton & Company.

Marx, K. (1978b). The future result of British rule in India. In R. C. Tucker (Eds.), *The Marx Engels reader*. New York: W. W. Norton & Company.

Marx, K. (1987). Peasantry as a class. In T. Shanin (Eds.), *Peasants and peasant societies*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Mazhar, F. (2009). Agriculture: Nothing to expect from Copenhagen, Opinion, *BD News 24. Com.* Retrieved 21 April 2010, from http://opinion.bdnews24.com/ 2009/12/03/agriculture-nothing-to-expect-from-copenhagen/

McIvor, A. L., Spencer, T., Möller, I., & Spalding, M. (2012). Storm surge reduction by mangroves. *Natural coastal protection series: Report 2, Cambridge Coastal Research Unit Working Paper 41*, 1-35. Online: The Nature Conservancy and Wetlands International.

Nielsen, I. L., Smyth. R. L., & Vicziany, A. M. (2007). Movement of the masses in the global economy. In I. Nielsen, R. Smyth & M. Vicziany (Eds.), *Globalisation and labour mobility in China* (pp.1-18). Victoria: Monash Asia Institute, Monash University Press.

Pasteur, K. (2011). *From vulnerability to resilience: A framework for analysis and action to build community resilience*. Warwickshire: Practical Action Publishing Ltd.

Popkin, S. L. (1979). *The rational peasant: The political economy of rural society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.

Popkin, S. L. (1980). The rational peasant: The political economy of peasant society. *Theory and Society, 9*(3), 411-471.

Ray, K. R. (1973). The Crisis of Bengal Agriculture, 1870-1927: The dynamics of immobility. *Indian Economic and Social History Review, 10*(3), 244-279.

Ribiere, M. (Producer). (2001). Venice, the sinking city. [Documentary] Retrieved 15 January 2014, from http://www.cultureunplugged.com/play/ 6131/Venice--the-Sinking-City

Schendel, V. (2009). *A history of Bangladesh*. Cambridge: Cambridge University Press.

Scott, J. C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. New Haven: Yale University Press.

Scott, J. C. (2009). *The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

Sen, A. K. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford: Clarendon Press.

Shahabuddin, Q. (1991). *Peasant behaviour under uncertainity: Decision-Making among Low-income farmers in Bangladesh*. Dhaka: Binimoy Printers.

Siddiqui, T. (2003). *Migration as a livelihood strategy of the poor: The Bangladesh case.* Paper presented at the Migration, Development, and Pro-poor Policy Choices in Asia, Dhaka.

Toufique, K. A., & Yunus, M. (2013). Vulnerability of livelihoods in the coastal districts of Bangladesh. *Bangladesh Development Studies, XXXVI*(1), 95-120.

UNISDR. (2004). *Priority areas to implement disaster risk reduction: Building disaster resilient communities and nations*. Retrieved 10 February 2011, from http://www.unisdr.org/2004/wcdr-dialogue/terminology.htm

Wittfogel, K. A. (1953). The ruling bureaucracy of oriental despotism: A phenomenon that paralyzed Marx. *The Review of Politics, 15*(3), 350-359.

Woldringh, R.F. , & New, B.M. (1999). Embankment design for high speed trains on soft soils. In F. B. J. Barends (Ed.), *Geotechnical engineering for transportation infrastructure: Theory and practice, planning and design, construction and maintenance*. Amsterdam, Netherlands: Balkema.

Wolf, R. (1969). *Peasant wars of the twentieth century*. New York: Harper & Row.

Wood, G. (2003). Staying secure, staying poor: The faustian bargain. *World Development, 31*(3), 455-471.

World Bank. (2009). *World development report 2009: Reshaping economic geography*. Washington DC: World Bank.

World Bank. (2013). World Bank provides $400 million to upgrade Bangladesh's embankment system. Retrieved 22 March 2014, from http://www.worldbank.org /en/news/press-release/2013/06/28/world-bank-provides-400-million-to upgrade- bangladeshs-embankment-system